গল্প-কথা-দৃশ্য : উপভোগ বনাম হুমকি

উম্মে রায়হানা

‘History is his story; women need to write her story’

স্টোরি শব্দটিতে অদ্ভুত একটা মাধুরী আছে। মানুষের গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। প্রাচীনকালে লেখার রীতি আবিষ্কারের আগে মানুষের কথা, কাহিনি আর ইতিহাস গল্পের রূপ ধরেই প্রবাহিত হতো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। স্টোরি শব্দের মধ্যে আছে একটা সিনেমা সিনেমা গন্ধও। নামের সঙ্গে স্টোরি শব্দটা আছে এমন অনেক সিনেমা আছে পৃথিবীতে; যেমন লিসবন স্টোরি (১৯৯৪), কিচেন স্টোরিজ (২০০৩), আই হেট লাভ স্টোরিজ (২০১০), ইত্যাদি। মাই স্টোরি নামে আত্মজীবনী লিখেছেন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব; যেমন মেরিলিন মনরো।

উপরের স্লোগানটিতে মানবেতিহাসের পুরুষাধিপত্যবাদী দিকটি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা কেবল শব্দের খেলাই নয়, বরং একটি অতি অপ্রিয় সত্য কথা। এই স্লোগানে স্টোরি শব্দটি প্রচলিত অর্থের সঙ্গে হারিয়ে ফেলে তার মোহনরূপও।

সাংবাদিকতার ভাষায় যেকোনো সংবাদকেই স্টোরি বলা হয়। সে হিসেবে ধর্ষণের খবরকে বলা হয় ‘রেপ স্টোরি’, যার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ‘ধর্ষণগল্প’ বা ‘ধর্ষণের গল্প’— পত্রপত্রিকায় ধর্ষণসংবাদকে গল্পের ন্যারেটিভ দিয়ে বাঙময় করে তোলার অভিযোগ বহু পুরানো। এ ধরনের উপস্থাপনের চর্চা আরো আগের, যা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

ধর্ষণসংবাদে প্রায়ই নারীর প্রতি অপমানজনক ও আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করা হয়। রেপ স্টোরির ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত এই শব্দগুলো এখন অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে; যেমন ‘জোরপূর্বক’, ‘উপর্যুপরি’, ‘রাতভর’, ‘পালাক্রমে’ ইত্যাদি। ধর্ষিত নারীর নাম প্রকাশ না করেও বুঝিয়ে দেওয়া হয় তার বয়স— ‘কিশোরী’, ‘তরুণী’, ‘ষোড়শী’, ‘যুবতী’, ইত্যাদি শব্দ দিয়ে নিপীড়িত নারীকে যৌনবস্তু করে তোলা হয়।

কোনো ধর্ষণের ঘটনা সংবাদপত্রের পাতায় কিংবা এমনিতেও গল্প হয়ে ওঠা উচিত কি না, সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। তবে ধর্ষণ সম্পর্কে প্রচলিত সব রকমের চর্চা থেকে এটুকু বুঝতে পারা যায় যে, সামাজিকভাবে ধর্ষণের গল্প যতটা মর্মান্তিক, ঠিক ততটাই ‘উপভোগ্য’ও বটে।

এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ পাওয়া যায় বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে। সত্য তথ্য প্রকাশের যে দায় সংবাদপত্রের আছে, সিনেমার তা নেই। অথচ পত্রিকার পাতা খুললেই যেমন এক বা একাধিক ধর্ষণ সংবাদ পড়তে আমরা বাধ্য হই, ঠিক তেমনি বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে দেখতে পাই এক বা একাধিক ধর্ষণ বা ধর্ষণচেষ্টার দৃশ্য।

এই লেখা শুরু করার আগে ছোটমতো একটা জরিপ করলাম। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দশজন বন্ধুর কাছে জানতে চাইলাম, 'চলচ্চিত্রে ধর্ষণ দৃশ্য দেখানোর প্রধান কারণ কী?'— সবচেয়ে বেশি যে উত্তরটি পাওয়া গেল, সেটা সাধারণভাবেই আমাদের জানা, আর তা হলো : 'বাণিজ্যিক কারণে'।

এই প্রশ্নোত্তর পর্বের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করা দরকার— ধর্ষণ দৃশ্যের বাণিজ্যিকীকরণ সম্পর্কে প্রচলিত জনমতটাকে আরেকটু ঝালিয়ে নেওয়া। বলা বাহুল্য, 'দশ' কোনো মতামত প্রতিষ্ঠা করার জন্য গ্রহণযোগ্য সংখ্যা নয়, বরং এই মতামত জরিপের মাধ্যমে একপেশে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

কারণ আমার বন্ধুরা কেউই বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের (খেটে খাওয়া রিকশাচালক বা গার্মেন্টসকর্মী) দর্শক নন। বরং তারা ছাত্র, গণমাধ্যমকর্মী, ব্লগার, শিল্পী, শিক্ষক— অর্থাৎ যাদের সমাজের সচেতন অংশ বলে মনে করা হয়— এমন মানুষ। ফলে তাদের মতামত সাধারণের চেয়ে আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক।

উত্তরদাতাদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি 'পুরুষের আধিপত্য বিস্তার' বা 'শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ/প্রতিষ্ঠা'র কথা বলেছেন। কিন্তু তারাও প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ব্যবসাকেই।

শুধু বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রই নয়, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বানানো ঐতিহাসিক সিনেমাগুলোতেও একইরকমভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ধর্ষণ।

"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারীর মূল অবয়ব সে ধর্ষিত। অস্বীকার করার উপায় নেই মুক্তিযুদ্ধের দেশী-বিদেশী সকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত ইতিহাস আমাদের বলে যে ১৯৭১ সালে এ দেশের নারী ব্যাপকহারে ধর্ষিত। সেই সত্যকে না চাপিয়ে তাকে ইতিহাসের আখ্যানভাগে নিয়ে আসা অবশ্যই সাহসের পরিচয়। মূলধারার ইতিহাসের জন্য তো বটেই, চলচ্চিত্রের জন্যও। মজার বিষয় হলো, এমন একটি চলচ্চিত্রও নেই যেখানে দেখানো হয়েছে যে ধর্ষিত হবার কারণে তাকে সমাজ থেকে কী ধরনের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। ফলে এসব চলচ্চিত্র তিন ধরনের উদ্দেশ্য সাধন করেছে। এক— ধর্ষণ-দৃশ্যকে দেখিয়ে বাণিজ্য করেছে। দুই— সেই ধর্ষিতকে মহানুভবতা দেখানোর জন্য পুরুষ-চরিত্র নিয়োজিত করেছে, নির্যাতিত নারীদের ব্যাপারে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্যায় আচরণকে অদৃশ্য করেছে। বরং ধর্ষিতকে দিয়েই নিজেকে নষ্ট-কলুষিত প্রচার করিয়েছে এবং তিন— তাকে মেরে ফেলেছে বা আত্মহত্যা করিয়েছে।" (গায়েন, ২০১২)।

"মুক্তিযুদ্ধে নারীর সরাসরি যুদ্ধ করার বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র 'গেরিলা' ছাড়া আর কোথাও নেই। অপেক্ষা করতে হয়েছে চল্লিশ বছর।" কাবেরী গায়েনের সঙ্গে একমত পোষণ করেও আমরা স্মরণ করতে পারি জয়া আহসান ও শতাব্দী ওয়াদুদ অভিনীত ধর্ষণচেষ্টার দৃশ্য এবং নায়িকা হবার সুবাদে ব্যাপকরকম ধস্তাধস্তির পরও জয়া আহসানের সতীত্ব অক্ষত থাকার প্রচলিত বাণিজ্যিক ফর্মুলা।

"বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এর অপরিমিত যৌননির্ভরতা, যা নারীর প্রকাশ্য ও সরাসরি দমিতকরণকেই নির্দেশ করে। তাই ইমেজ, ন্যারেটিভ, নগ্নতা বা অশ্লীলতায় পর্নোছবি ও যৌনতানির্ভর মূলধারার চলচ্চিত্রের মাঝে অগণিত অমিল থাকলেও; উভয় উৎপাদনের পেছনে যে লিঙ্গবৈষম্যপন্থী

পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শটি ক্রিয়াশীল তা এক ও অভিন্ন। উভয়ক্ষেত্রেই নারী ব্যবহৃত ও নির্যাতিত এবং নারীর উপর পুরুষের পীড়ন যৌনবিনোদন হিসেবেই পরিবেশিত।" (সুলতানা, ১৯৯৮)।

শেখ মাহমুদা সুলতানার ব্যবহৃত এই 'যৌনবিনোদন' কথাটা নিয়ে আমি আমার পরবর্তী আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমার উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র একজন 'পুরুষ দর্শককে মাথায় রেখে' বাণিজ্য করার জন্য 'ধর্ষণ দৃশ্য' ব্যবহার করা হয় বলে নিজের মতামত জানিয়েছেন। বাকিরা সরাসরি 'সিডিউস', 'সুড়সুড়ি', 'অবদমিত বাসনার প্রকাশ', ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

"এখানেই প্রশ্ন চলে আসে শ্রোতা-দর্শক-পাঠক হিসেবে নারীর প্রয়োজন গণমাধ্যম কতটুকু পূরণ করছে? গণমাধ্যম কি নারীকে তার অডিয়েন্স মনে করে? সংবাদপত্রে ধর্ষণের বর্ণনা কি পড়তে চায় একজন নারী? চলচ্চিত্রে নারী যেভাবে উপস্থিত, তাতে আরেক নারী কি বিনোদন লাভ করে?" (নাসরিন, ২০০৬)।

গীতি আরা নাসরিনের উত্থাপিত এই প্রশ্নের জবাব একেবারেই সরলরৈখিক নয়। নারীবাদী চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক লরা মালভি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ ভিজ্যুয়াল প্লেজার অ্যান্ড ন্যারেটিভ সিনেমা (১৯৭৫)-তে বলেছেন, নারীকে সিনেমা থেকে আনন্দ পেতে হলে গ্রহণ করতে হয় পুরুষের দৃষ্টি বা 'মেল গেজ'। মালভির মতে, এই মেল গেজ মূলত তিনভাবে কাজ করে। প্রথমত, পরিচালক ক্যামেরাকে ব্যবহার করে নারীকে দেখেন ও দেখান; দ্বিতীয়ত, পর্দার পুরুষ চরিত্র নারী চরিত্রকে দেখে এবং তৃতীয়ত, পুরুষ দর্শক পর্দার নারীকে দেখে। এভাবে ক্রমাগত নারীকে দৃশ্য করে তোলার মাধ্যমে কাজ করে দর্শনের আনন্দ বা ভিজ্যুয়াল প্লেজার।

সে কারণে পর্দার নারীর সঙ্গে আইডেন্টিফাই না করে পর্দার পুরুষ বা দর্শক সারিতে বসে থাকা পুরুষের অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নারী দর্শককে। আবার যেহেতু সক্রিয় দর্শক হয়ে পর্দার নারীকে দৃশ্য বানিয়ে আনন্দ পাওয়া অনেক সময়ই নারী দর্শকের পক্ষে সম্ভব হয় না, ফলে সে উপভোগ করে অক্রিয়তাকে, দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠাকে, মালভি যার নাম দিয়েছেন 'টু-বি-লুকড-এট-নেস'।

মালভির এই মতামত নির্দিষ্টভাবে ধর্ষণদৃশ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে বলতে হয়— চলচ্চিত্রে ধর্ষণদৃশ্য দেখে আনন্দ পেতে হলে নারীকে হয় ধর্ষক পুরুষের অবস্থানে গিয়ে পৌরুষের ক্ষমতা উপভোগ করতে হবে অথবা মর্ষকামী হতে হবে, উপভোগ করতে হবে পীড়ন।

নারীকে মর্ষকামী হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে পুরুষের ধর্ষণকে জায়েজ করে তোলা যায়। আর সাহিত্যের পাতা থেকে শুরু করে সিনেমার পর্দা পর্যন্ত সেই চেষ্টার কোনো কমতি কোথাও নেই।

সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণকে ভিত্তি করে মালভি তাঁর তত্ত্ব দিয়েছেন হলিউডের প্রচলিত সাধারণ ন্যারেটিভ সিনেমা নিয়ে। ব্যবহার করেছেন আলফ্রেড হিচককের বিভিন্ন ছবির উদাহরণ। পরে ম্যারি এন ডোন দ্য ডিজায়ার টু ডিজায়ার (১৯৮৭) গ্রন্থে ফ্রয়েডের বিভিন্ন টার্ম আরো বিস্তারিতভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি ১৯৪০-এর দশকের 'উইমেনস ফিল্ম' বা নারীপ্রধান চলচ্চিত্রগুলোকে ফোকাস করেছেন তাঁর কাজে। হিচককের ছবির উদাহরণ দিয়েই 'প্যারানয়া অ্যান্ড স্পেকুলার' নামক অধ্যায়ে ডোন দেখিয়েছেন 'টু-বি-লুকড-এট-নেস' নারীর জন্য সবসময় আনন্দদায়ক নয়। বরং প্যারানয়া, হরর ও গথিক ছবির ভিত্তিই হচ্ছে ভয়, যে ভয়ের উৎস 'টু বি ওয়াচড'। বলা বাহুল্য, এসব ছবিতে এই ভীতির ভিকটিম অবশ্যই নারী।

প্যারানয়া, ফিল্ম নায়র, গথিক ও হরর ছবির পরে ১৯৭০-এর দশকে হলিউডে নারীর ভয় ও পীড়নকে ভিত্তি করে একটি জেনর তৈরি হয়। একে হরর ছবির সাব-জেনর হিসেবেও চিহ্নিত করেন অনেকে। সেটা হচ্ছে

'রেপ-রিভেঞ্জ ফিল্ম'। এ ধরনের ছবিতে নারী প্রোটাগনিস্ট প্রথমে ধর্ষিত ও নিপীড়িত হয়, তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয় বা মৃত ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সে বেঁচে যায় ও পরবর্তী সময়ে প্রতিশোধ নেয়।

হলিউডে এইসব ছবির জনপ্রিয়তা এতই বেশি যে, ১৯৭২ সালে নির্মিত 'দ্য লাস্ট হাউজ অন দ্য লেফট' নামের একটি ছবি ২০০৯ সালে রিমেক হয়েছে। 'আই স্পিট অন ইয়োর গ্রেভ' নামের ১৯৭৮ সালের রেপ রিভেঞ্জ ছবিটি আবারো তৈরি হয়েছে ২০১০ সালে।

ধর্ষণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নারীর কখনো কখনো প্রেমিকের দরকার হয়, কখনো বা হয় না। 'ইরিভারসেবল' (২০০২) ছবিতে নায়িকার প্রেমিক চরম নিষ্ঠুরতা দেখায় ধর্ষকের প্রতি। 'মনস্টার' (২০০৩) ছবিতে নায়িকা নিজেই সমস্ত পুরুষজাতির প্রতি ভয়ানকভাবে হিংস্র হয়ে ওঠে।

এই জেনর নিয়ে এত বিস্তারিত আলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি— প্রথমত, বাংলাদেশ ও ভারতের চলচ্চিত্রের ভাষা ও ট্রিটমেন্ট হলিউডের আদলে গড়ে উঠেছে। ফলে বাংলাদেশের ছবির আলোচনা হলিউডকে বাদ দিয়ে করা খুব মুশকিল। আর দ্বিতীয়ত, এই জেনর বাংলাদেশ ও ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয় ও চর্চিত হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে হলিউডের 'স্লিপিং উইথ দ্য এনিমি' (১৯৯১), মুম্বাইয়ের 'অগ্নিসাক্ষী' (১৯৯৬) ও ঢাকার 'রাঙাবউ' (১৯৯৮) ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনটি ছবির কাহিনি অভিন্ন ও ছবিগুলোর মূল উপজীব্যই হচ্ছে নারীর পীড়ন। রেপ রিভেঞ্জ ছবির নিয়ম অনুযায়ী এই ছবিগুলোতে নায়িকা নিজে বা তার প্রেমিক রক্তাক্ত সংঘর্ষের মাধ্যমে ধর্ষক/নিপীড়ককে হত্যা করে অথবা বাণিজ্যিক ছবির চিরাচরিত নিয়মে ভিলেন কোনো-না-কোনোভাবে মরে যায়। নায়িকা নিজে বেঁচে গিয়ে, পুরানো পরিচয় মুছে ফেলে নতুন জীবন শুরু করার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি এক ধরনের শোধ নেয়।

ধর্ষণের শোধ নেওয়া আমরা দেখতে পাই ভারতের 'ব্যান্ডিট কুইন' (১৯৯৪) ছবিতে। পরিচালক শেখর কাপুর ফুলন দেবীর জীবনকে ভিত্তি করে সত্যি কাহিনি অবলম্বনে ছবিটি বানালেও ছবির ফর্মুলা ছিল রেপ রিভেঞ্জ ফিল্মের। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফুলন দেবী নিজে কিন্তু ছবির ধর্ষণদৃশ্য পছন্দ করেন নি। তিনি গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সিনেমায় এ ধরনের দৃশ্য দেখানো উচিত নয় বলেই তিনি মনে করেন।

কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ধর্ষণের দৃশ্য যত বেশি দেখা যায়, শোধ নেওয়ার ঘটনা সেই পরিমাণ দেখা যায় না। দেখা গেলেও সেটা বেশির ভাগ সময়ই ছবির মূল নায়িকার সাথে ঘটে না, ঘটে নায়িকার বান্ধবী বা নায়কের বোনের সাথে। ধর্ষিত নারী প্রায় সবসময়ই মরে যায় অথবা তাকে ছবিতে আর দেখা যায় না। নায়ক অনেক সময় প্রবল প্রতাপশালী খলনায়ক বা তার সাগরেদদের মধ্য থেকে বোনের ধর্ষককে খুঁজে বের করে হত্যা করে। ছবির মূল কাহিনিতে ধর্ষণের প্রতিশোধের জন্য খুব সামান্য জায়গাই থাকে।

বাংলাদেশে রেপ রিভেঞ্জ ফিল্মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হতে পারে 'আম্মাজান' (১৯৯৯) ছবিটি। এই ছবিতে নায়ক মান্না শৈশবে মা শবনমের ধর্ষণদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ও বড়ো হয়ে একজন সিরিয়াল কিলারে রূপান্তরিত হয়। শবনম নিজ সন্তানের সামনে ধর্ষিত হবার লজ্জায় মূক হয়ে যান।

মাতৃস্নেহ নয়, সন্তানের দায়িত্ববোধ নয়, শবনম-মান্নার সম্পর্ক চালিত হয় ধর্ষণের সাপেক্ষে। মায়ের যৌন পবিত্রতা সন্তানের কাছে এবং মায়ের কাছেও জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। মা সন্তানের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। সন্তান একের পর এক ধর্ষককে হত্যা করে এসে মাকে সেই খবর দেয়। চোখের সামনে নিজের সন্তানকে খুনী হয়ে উঠতে দেখেও মুখ খুলতে পারেন না ধর্ষণের লজ্জায় জর্জরিত মা।

এই ছবিতে একদিকে নারীর যৌনতাকে যেমন তার জীবনের সর্বস্ব করে তোলা হয়েছে, তেমনি মহান করে তোলা হয়েছে মাতৃত্বকে। এ প্রসঙ্গে 'আম্মাজান আম্মাজান' গানটির লিরিকের দিকেও মন দেওয়া যেতে পারে।

"আম্মাজান আম্মাজান
বুকের খনি আম্মাজান চোখের মণি আম্মাজান
সবার আগে আমি আমার আম্মাজানরে চিনি রে
আম্মাজানরে চিনি
সালাম তারে আম্মাজানরে গড়িয়াছেন যিনি
আম্মাজান ছাড়া আমার জীবন গোরস্তান
আম্মাজান আম্মাজান
আম্মাজানের আঁচলতলে বেহেশতেরই ছায়া গো
বেহেশতেরই ছায়া
বুকে আছে দয়ার সাগর মনে তেমন মায়া
পাক পবিত্র মাটি দিয়া গড়া দেহখান
আম্মাজান আম্মাজান আপনি বড় মেহেরবান
জন্ম দিসেন আমায় আপনার দুগ্ধ করসি পান"

এই কথা থেকে বোঝা যায় মায়ের স্থান কত উঁচুতে। আবার গানের চিত্রায়ণে দেখতে পাই পুত্র তার মায়ের দেহ 'পাক পবিত্র মাটি দিয়া গড়া' দাবি করলেও মায়ের মনে চাবুকের আঘাত লাগার মতন ব্যথাবোধ হয়। মা যেন জানেন তার অপ্রকৃতিস্থ সন্তান কতটা বোকার স্বর্গে বাস করছে। মাস্তান ও সিরিয়াল কিলার সন্তানের মায়ের প্রতি সম্মান ও আনুগত্যের বিপরীতে মূক মায়ের ক্রমাগত অশ্রুবিসর্জন এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত করে যে একটি ধর্ষণ মায়ের উচ্চস্থানকেও ধসিয়ে দিতে পারে। মা সন্তানের দেওয়া সম্মান নিতে পারেন না বা নেওয়ার যোগ্যতা হারান।

বাংলাদেশের ছবি সম্পর্কে একটা নিষ্ঠুর সত্যি কথা হচ্ছে, মধ্যবিত্ত মূলধারার বাংলা ছবি দেখে না, কিন্তু তার সমালোচনা করতে শতমুখ হয়। তার উদাহরণ পাওয়া যায় প্রতিদিনের বাক্যালাপে, হাস্যরসে; যেমন 'তোর বাড়িতে মা-বোন নাই?', 'ছেড়ে দে শয়তান', 'জোর করে তুই আমার দেহ পাবি কিন্তু মন পাবি না', 'হা হা হা পালাবি কোথায় সুন্দরী'— এ ধরনের সংলাপ অনেক আড্ডাতেই হাসির হল্লা তুলতে পারে। নারীর অপমান ছাড়া হাস্যরস জমে খুব কম। আর তাই বাংলা ছবিতে ধর্ষণ বা ধর্ষণবিষয়ক সংলাপও হাসির উৎস হয়ে ওঠে। সামাজিকভাবেই হাস্যরসের মাধ্যমে নারীর নিপীড়নকে ক্রমাগত লঘু করে তোলা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে নারীর নিপীড়নকে লঘু করে তোলার আর একটি ধারা বেশ চোখে পড়ে। আর তা হচ্ছে হঠাৎই পশ্চিমা কোনো নারী সেলিব্রিটি নিজের ধর্ষণ অভিজ্ঞতার গল্প বলতে শুরু করেন; সর্বশেষ যেমনটা করেছেন 'বে ওয়াচ'খ্যাত অভিনেত্রী পামেলা এন্ডারসন কান ফেস্টিভালে। 'দ্য ডেইলি বিস্ট'-এর নারী বিভাগ 'উইমেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'সহ বেশ কিছু নারীবাদী পত্রপত্রিকা সাহসী বক্তব্যের জন্য পামেলাকে সাধুবাদ জানালেও ধর্ষণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে খতিয়ে দেখার অবকাশ রয়েছে।

পামেলার দাবি অনুযায়ী, তিনি জীবনে প্রথম যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন একজন নারীর কাছেই। পেডোফিলিয়া নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থাকতে পারে। অনেক শিশুই নারীদের কাছে যৌন হয়রানির শিকার হন। কিন্তু পামেলার এই দাবি স্পষ্টতই পুরুষের ধর্ষক ভূমিকাকে লঘু করে।

কেন তা ব্যাখ্যা করছি— বারো বছর বয়সে ধর্ষণ ও আরেকটু বড়ো হয়ে, টিনএজ-এ, দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হবার কথা জানান পামেলা। এই ধর্ষকরা সবাই তার চেনাজানা পুরুষ। প্রথমবার বন্ধুর বড়ো ভাই এবং দ্বিতীয়বার প্রেমিক ও তার বন্ধুরা। এদের অনেকেরই নাম জানেন তিনি। কিন্তু ছেচল্লিশ বছর বয়সে এসে পৃথিবীবিখ্যাত এই তারকা ধর্ষণের গল্প বললেও তিনি এর বিচার চেয়েছেন বা ধর্ষকদের বিরুদ্ধে পুলিশে রিপোর্ট করেছেন বা শাস্তি দাবি করেছেন এমনটা শোনা যায় নি। বরং পুলিশ প্রশাসনই উদ্যোগী হয়ে এই ধর্ষণের তদন্ত করার জন্য তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন বলে জানা যায় মেইল অনলাইনের খবরে।

বিচার বা শাস্তি দাবি না করলে একটি অপরাধ বা সহিংসতার খবর জনসমক্ষে বলা যাবে না এমন নয়। বরং এতদিন ধরে তিনি যে বলতে পারেন নি, কেন পারেন নি, তার জন্য সেই বাস্তবতা বা পরিপার্শ্ব ছিল না কেন— সে বিষয়েই মন দেওয়া উচিত।

কিন্তু গণমাধ্যমে তাঁর এই বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গিতে মনে হয় নি যে, এটা আদৌ একটা অপরাধ বা এর বিচার হওয়া উচিত। বরং 'সেক্স সিম্বল' হিসেবে পরিচিত পামেলার সঙ্গে ধর্ষণের মতো অপরাধ ঘটেছে, তার মানে ধর্ষণ ঘটে গেলেও যে নারীর যৌন আবেদন নষ্ট হয় না, যৌনবস্তু হয়ে উঠতে তার কোনো সমস্যা হয় না— সেটাই যেন প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ছিল। ফলে এই ধর্ষণগল্প বলার বা বলানোর উদ্দেশ্য আসলে কী, সেই বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েই যায়।

এই উপমহাদেশে এমন খোলাখুলি ধর্ষণ অভিজ্ঞতার বয়ান করার অবকাশ নেই। তবে বলিউডের অনেক তারকাই আজকাল যৌন হয়রানির বিষয়ে মুখ খুলছেন। সেসব হয়রানির মাত্রা প্রায় কখনোই ধর্ষণ পর্যন্ত বা ঘটনার দৌড় আদালত পর্যন্ত গড়ায় না। মিডিয়ায় ঝড় তোলা শেষ হয়ে গেলে সেসব ঘটনাও দ্রুত আড়ালে চলে যায়।

এখানে স্পষ্ট করা দরকার, আমি দাবি করছি না যে, শো বিজনেসের নারী তারকারা মিথ্যে অভিযোগ তুলে লাইমলাইটে আসতে চান বা তারা আদৌ হয়রানির শিকার হন না। উদাহরণগুলো দিয়ে এটাই বলতে চাচ্ছি যে, ব্যক্তি নারীর ধর্ষণ অভিজ্ঞতাকেও গণমাধ্যম আসলে নিজের মতো করে নিজের প্রয়োজনেই ব্যবহার করে, যেমনটা নারীর ঐতিহাসিক ধর্ষণ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা করেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র।

বাংলাদেশের মিডিয়ায় নারীর নিপীড়ন অভিজ্ঞতাকে লঘু করার নতুন ধারাটিও বেশ মজার। সরাসরি ধর্ষণ নয়, কিন্তু নারীর প্রতি নিপীড়ন নির্যাতনের একটি চরম রূপ হচ্ছে বেশ্যাবৃত্তি। বেশ্যাবৃত্তিকে নিপীড়ন হিসেবে না দেখে নারীর জন্য একটি পেশা হিসেবে দেখা যেতে পারে কি না সেটা অন্য প্রসঙ্গ। এ সময়ের বাস্তবতা এটাই যে নারী নিতান্ত বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে নেয় ও মানবেতর জীবনযাপন করে।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রায়ই কোনো লাস্যময়ী মডেল বা টেলিভিশন তারকার সম্পর্কে খবর দেখতে পাওয়া যায়, 'তিনি পতিতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন' বা 'উনি যৌনপল্লিতে গিয়ে শুটিং করেছেন' ইত্যাদি। সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে অবাস্তব উচ্চকিত সাজে ওই নায়িকা বা মডেলের আবেদনময় ছবি। এতে পত্রিকার

কাটতি বাড়ে, ওয়েব পোর্টালের হিট বাড়ে। এতে কোনোমতেই একজন যৌনকর্মীর প্রতি সহানুভূতি বা তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে না।

কথা হচ্ছিল ধর্ষণের গল্প, খবর আর দৃশ্য নিয়ে। পুরুষের ধর্ষকামকে লঘু করা আর অবদমিত বাসনাকে উস্কে দিয়ে যৌনবিনোদন দেওয়া ছাড়াও খবরের কাগজে ধর্ষণসংবাদ, নায়িকার ধর্ষণ অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে সিনেমায় ধর্ষণদৃশ্য পর্যন্ত রেপ স্টোরি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ করে বলে আমার মনে হয়।

গণমাধ্যমের অডিয়েন্স হিসেবে নারী যতই অদৃশ্য হোক না কেন, নারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না কেউই। পুরুষকে তার পৌরুষিক ক্ষমতার ঝলকানি দিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করানোর সাথে সাথে নারীর জন্যও একটি মেসেজ দেয় এসব গল্প। আর তা হচ্ছে সামাজিকভাবে নারী সর্বদা যে ধর্ষণভীতির মধ্যে বসবাস করে, যা থেকে নারী হিসেবে জন্মানো কোনো মানুষের এক মুহূর্তের জন্যও মুক্তি নেই, সেই ভীতিকে উস্কে দেওয়া।

এ যেন ঝিকে মেরে বউকে শেখানোর পদ্ধতি। পুরুষের বিকৃত কামনা চরিতার্থ করে বাণিজ্য করার সঙ্গে সঙ্গে নারীকে ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকে গণমাধ্যম। হোক সেটা সংবাদপত্রের রেপ স্টোরি বা সিনেমার ধর্ষণদৃশ্য। ধর্ষণ সম্পর্কে কোনোরকম অভিজ্ঞতা নেই, ভীতির চেহারা সম্পর্কে কোনোরকম ধারণা নেই, বারো বছর বয়সের এমন একটি মেয়েও একটা রেপ স্টোরি পড়েই বা একটা সিনেমা দেখেই সারা জীবনের জন্যে সিধে হয়ে যেতে পারে।

বাবা মায়ের ওপর অভিমান করে ঘর থেকে পালিয়ে যায় বহু কিশোর। কিন্তু কয়জন কিশোরী যায়? বাংলায় প্রবাদ আছে, পুরুষের রাগে বাদশা নারীর রাগে বেশ্যা। ঘর পালানো কিশোর বিদেশে গিয়ে ভাগ্য ফেরায়, ফিরে আসে রাজা হয়ে। ঘর পালানো মেয়ে ধর্ষিত হয়, আর তার স্থান হয় বেশ্যালয়ে।

এই চরম পরিণতির ভয়ে ভীত করে নারীকে দমন করার জন্য ধর্ষণদৃশ্যের মতন, রেপ স্টোরির মতন মোক্ষম অস্ত্র আর কী হতে পারে?

উম্মে রায়হানা গণমাধ্যমকর্মী। ummerayhana@gmail.com

উল্লেখসূত্র

- কাবেরী গায়েন (২০১২), 'মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ', বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের গবেষণা প্রকল্পের আওতাধীন গবেষণাকর্ম
- গীতি আরা নাসরিন (২০০৬), 'গণমাধ্যম ও নারী', নারী বিষয়ক ছোটকাগজ চন্দ্রাবতী, ১ম সংখ্যা
- শেখ মাহমুদা সুলতানা (১৯৯৮), 'ঢাকার চলচ্চিত্রে নারী : দানব, দেবতা ও পতির রাজ্যে— নষ্টা, এক্সট্রা ও সতী', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে রচিত অভিসন্দর্ভ থেকে প্রণীত প্রবন্ধ
- Laura Mulvy (1975), 'Visual Pleasure and Narrative Cinema', Originally Published-Screen 16.3 Autumn 1975
- Mary Ann Doane (1987), 'The Desire to Desire', Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis